চাণক্য চাকলাদারের
ফ্যান্টাসায়েন্স

অদ্রীশ বর্ধন

সম্পাদনা : সন্তু বাগ

ফ্যানট্যাস্টিক ও কল্পবিশ্ব পাবলিকেশনস
যৌথ প্রয়াস

সূচিপত্র

উপন্যাস

চাণক্য চাকলাদারের বিচিত্র কীর্তিকথা	৩৩
আবার চাণক্য চাকলাদার!	১৫৩
দ্বিতীয় কুম্ভকর্ণ	১৮৮
তুহিন-তমাল শ্বেত-প্রহেলিকা	২২৯

গল্প

চাণক্য চাকলাদার আর প্রহেলিকা	২৭১
দু-বোতল চাটনি	২৭৮
চাণক্য চাকলাদার ও মমি	২৯৮
ভূতোকাশি সিরাপ	৩০১
ভূতেরা বিজ্ঞান চায় না	৩০৯
চাণক্য চাকলাদার ও বনমানুষের পা	৩১৪
শৈত্য নামক দৈত্য	৩১৭
আরব্য আতঙ্ক	৩৪৪
তেজস্ক্রিয় মণিক	৩৬০

ভয়ংকর ভুড়ু	৩৬৭
জীবন্ত পাথর	৩৭৩
ভার্গব বসুর হারানো মাথা	৩৮১
পাইনবনের প্রহেলিকা	৩৮৬
মেডুসার মুন্ডু	৩৯৮
রসাতল রহস্য	৪১৩
বেড়াল মমি	৪৪৩
গুলবাজ চাণক্য ও বইমেলা	৪৪৭
পুষ্পকের পরিণতি	৪৫০
ভূত গ্রহ	৪৫৬
লঙ্কাকাণ্ড	৪৭৬
পরিশিষ্ট	৪৭৯

অদ্রীশ বর্ধন: এক বহুমুখী সাহিত্য প্রতিভা

হার্বার্ট জর্জ ওয়েলসের লেখা 'দ্য ফার্স্ট মেন ইন দ্য মুন' উপন্যাসটি ইংল্যান্ডের স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। ১৮৯১এর জানুয়ারি মাসে স্ট্র্যান্ডের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার প্রায় বছর দশেক বাদে উপন্যাসটি লেখা হয়। ১৯০০ সালের ডিসেম্বর মাসে স্ট্র্যান্ডের কুড়িতম খণ্ডের (স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনের অক্টেভো সাইজের আড়াইশো ইলাস্ট্রেশনসহ দুশো পাতার সেই বিশেষ ক্রিসমাস সংখ্যাটির দাম ছিল এক শিলিং, আজকের দিনের হিসেবমতো যা তিন টাকা সাতষট্টি পয়সা।) ১২০তম সংখ্যার, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৯৭ থেকে ৭০৫, এই নয় পাতা ধরে উপন্যাসের প্রথম কিস্তিটি বেরোয়। স্ট্র্যান্ডের প্রধান সম্পাদক তখন হারবার্ট গ্রিনহাউ স্মিথ। দশ কিস্তিতে প্রকাশিত সেই উপন্যাসের অন্তিম পর্বটি ছাপা হয় ১৯০১ সালের আগস্ট মাসের ২২তম খণ্ডের ১১৮তম সংখ্যার ১৪১ থেকে ১৪৯ পাতা, এই নয় পাতা জুড়ে। আগাগোড়া দশটি কিস্তিতেই অসাধারণ ছবি এঁকেছিলেন প্রখ্যাত ব্রিটিশ ইলাস্ট্রেটর ক্লদ এলিন সেপার্শন। আগস্টের সেই সংখ্যাতেই প্রকাশিত হতে শুরু করে আর্থার কোনান ডয়েলের হাড়কাঁপানো উপন্যাস 'দ্য হাউন্ড অফ দ্য বাস্কারভিল্‌স', যার ইলাস্ট্রেশনের দায়িত্বে ছিলেন সিডনি প্যাগেট। সেই বছরের শেষের দিকে, ইংল্যান্ডের জর্জ নিউম্যান প্রকাশনালয় থেকে নীল কাপড়ে সোনালি ক্যালিগ্রাফিক ফন্টের কভার নিয়ে উপন্যাসটির হার্ডবাউন্ড এডিশন ছাপা হয়েছিল।

পরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের বাংলা অনুবাদে এইচ জি ওয়েলসের সেই বইটিই আমার পড়া প্রথম সায়েন্স ফিকশন। দেব সাহিত্য কুটিরের বই, ষাটের দশকের শেষ দিকে ছাপা। পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষাবিভাগ কর্তৃক প্রাইজ ও লাইব্রেরির জন্য অনুমোদিত অনুবাদ সিরিজের অংশ হিসেবে দেব সাহিত্য কুটির অমূল্য কিছু শিশু ও কিশোর অনুবাদ ছেপেছিল ষাট আর সত্তরের দশকে। বইগুলোর মলাট খুললেই

প্রথম পাতায় থাকত বইয়ের এবং অনুবাদকের নাম। দ্বিতীয় পাতায় থাকত গাউন ধরনের পাশ্চাত্য পোশাকে সজ্জিতা এক সুন্দরী কিশোরীর ছবি। সেই কিশোরী দু-হাত বাড়িয়ে, কোমরে তলোয়ার ঝোলানো এক রূপবান যুবকের থেকে ফুলের বোকে নিচ্ছে। এই যুগলের ছবিটি সম্ভবত ময়ূখ চৌধুরী এঁকেছিলেন। ছবির তলায় লেখা থাকত "উপহার" আর তার নীচে তিনটে সমান্তরাল লাইন। সেই লাইনগুলোর মধ্যে যাকে বই উপহার দেওয়া হবে তার নাম, এবং কে দিচ্ছেন তার নাম লেখা হত খুব যত্ন করে। বই তখন ছিল প্রধান উপহার সামগ্রী। বই উপহার দেওয়া, এবং পাওয়া, কালচার্ড মাইন্ড এবং রুচির লক্ষণ বলে মনে করা হত।

দেব সাহিত্য কুটিরের এই সিরিজে সুধীন্দ্রনাথ রাহা, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, কমলাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, মধুসূদন মজুমদার, পরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, অরুনচন্দ্র মজুমদার, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায় প্রমুখেরা অসাধারণ অনুবাদ করতেন বিখ্যাত ওয়ার্ল্ড ক্লাসিক্সগুলির। এইসব অনুবাদকেরা কী অসাধ্য সাধন করে গেছেন তাঁদের সময়ে, ভাবলে অবাক হতে হয়। বহু খণ্ডের মহাকায় উপন্যাস জন গল্‌সওয়ার্দির 'ফর্সাইট সাগা' বা টমাস মানের 'বাডেনব্রুকস'কে মাত্র তিরিশ-চল্লিশ পাতার মধ্যে কিশোর-কিশোরীদের পাঠের উপযুক্ত করে রসোত্তীর্ণ অনুবাদ সহজ কাজ নয়। মনে রাখতে হবে ষাট সত্তর দশকের রক্ষণশীল মধ্যবিত্ত পরিবারের বালক-বালিকা বা কিশোর-কিশোরী পাঠ্য লেখায় প্রেম শব্দটি পর্যন্ত নিষিদ্ধ থাকত প্রায়শই। সেই রক্ষণশীলতা বজায় রেখে উপন্যাসের মূল রূপটি অক্ষুণ্ণ রাখার মতো অসম্ভব কঠিন কাজ বছরের পর বছর ধরে যাঁরা করে এসেছেন, সেইসব অনুবাদকদের কাজ ফরম্যাল অ্যাকাডেমিশিয়নদের থেকে কম মূল্যবান ছিল না সেটা বলাই বাহুল্য। দুঃখের বিষয়, এইসব অনুবাদকদের নিয়ে কোনো আলোচনা হতে দেখি না কোথাও। সুধীন্দ্রনাথের রচনাসমগ্র বেরোতে শুরু করেছে, দেব সাহিত্য কুটিরই বার করছে রূপক চট্টরাজের সম্পাদনায়, কিন্তু বাকিদের নামোল্লেখটুকুও দেখি না আজকাল। কোথায় হারিয়ে গেলেন এঁরা, এইসব অসাধারণ অনুবাদকরা? আত্মবিস্মৃত বাঙালি, ওয়েস্টার্নাইজেশনের চাকচিক্যে হেদিয়ে মরা "আধুনিক" বাঙালি এঁদের মনেও রাখল না। এই বাঙালিই আবার আলেক্স হেলির রুটস এর কুন্টা-কিনটে নিয়ে আবেগতাড়িত প্রবন্ধ লেখে পত্রপত্রিকায়। ভিখারিই শুধু নয়, বাঙালি দ্বিচারীও বটে!

ওয়েলসের উপন্যাসের প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। বইটি আমার বাবা কিনে দিয়েছিলেন আমার বছর সাতেক বয়েসে। বাবার প্রবল ঝোঁক ছিল বিশ্বসাহিত্যে,

চাণক্য চাকলাদারের বিচিত্র কীর্তিকথা

মুখবন্ধ

চাণক্য চাকলাদার আমারই নাম। থাকি মুচিপাড়ার মেসে। সারাদিন উদ্ভট বই পড়ি। ফ্যান্টাসি ফিল্‌ম দেখি। প্রতি সন্ধ্যায় আফিম খাই। তারপর ডায়েরি লিখতে বসি।

আমি বৃদ্ধ। কুব্জ। পলিতকেশ। আমি রোগজীর্ণ, বদহজমে শীর্ণ, যমেরও অরুচি। কিন্তু একদিন আমি ছিলাম দুরন্ত, দুর্মদ, দুর্বার। সারা পৃথিবী ছিল আমার কর্মক্ষেত্র। সুমেরু থেকে কুমেরু পর্যন্ত হেন স্থান নেই যেখানে আমার লীলাখেলা ঘটেনি; যেখানকার আরক্ষাবাহিনী আমার হুহুংকারে কাঁপেনি; আমার প্রতাপে নাকানিচোবানি খায়নি।

আমি ছিলাম প্রচণ্ড, প্রবল, প্রলয়ংকর। মাথায় ছিলাম সাত ফুট। আকারে তালপাতার সেপাই। কিন্তু পরাক্রমে আমার কাছে নতিস্বীকার করেছিল মার্জারের মতো নিঃশব্দ চরণ, মূর্তিমান আতঙ্ক মাসা দাউদ আর তার কুচুন্ডে স্যাঙাতরা।

অতীতের সে রোমাঞ্চ-কাহিনি এই বৃদ্ধ বয়েসেও শিহরন আনে প্রতিটি লোমকূপে। তাই আফিম খেয়ে বুঁদ হয়ে নিয়ে বসি ডায়েরি লিখতে। কীর্তিকথার ছত্রে ছত্রে বর্ণনা করি হার্মাদ মেয়ে ইসাবেলার সঙ্গে আমার দেহাতীত প্রেমের উদ্ভট কাহিনি। মিসেস ফ্যান্টমাসের সঙ্গে পাঞ্জা কষার অলীক উপাখ্যান।

অলীক! উদ্ভট! সবাই তা-ই বলে। বলে, মৌতাতের মুহূর্তে লেখা তো! বলে, ঘনাদার সেকেন্ড এডিশন! ব্রজদার ভায়রাভাই!

একটা কাহিনি আপনাদের শোনাচ্ছি। আপনারাই বলুন, অলীক কি না, উদ্ভট কি না। চাণক্য চাকলাদারের চালিয়াতি বদনাম আপনারাই খণ্ডন করুন।

***

নয়াদিল্লি। রাত প্রায় দশটা।

ঢালু পথ বেয়ে কক্ষচ্যুত উল্কার মতো নেমে এল একটা প্রকাণ্ড বেন্টলি গাড়ি। ছুটছে ভিড়ের মধ্যে দিয়ে। চাপা গালিগালাজের শব্দ শোনা গেল। দু-পাশে ছিটকে গেল গাড়ি আর পথচারী।

পেছনে মখমল-কোমল আসনে উপবিষ্ট দুজন পুরুষ গভীর আলাপে মগ্ন। এঁদের একজন 'হান্টার'-এর কেন্দ্রীয় দফতরে চিফ সেক্রেটারি। ধরা যাক, এঁর নাম সর্দার বন্দুক সিং। অপরজন সর্দারজির ডান হাত—ত্র্যম্বকলাল।

'হান্টার' একটা আন্তর্জাতিক সংস্থা। বিশ্বের তাবৎ ব্যবসায়ীদের অর্থে স্থাপিত এবং চালিত 'হান্টার'-এর কার্যকলাপ অতীব প্রহেলিকাবৎ।

'হান্টার'-এর এজেন্ট ছড়ানো বিশ্বের সর্বত্র। অথচ 'হান্টার'-এর অস্তিত্ব মুষ্টিমেয় ব্যক্তি ছাড়া বিশ্বের আর কেউ জানে না। অর্থাৎ 'হান্টার' একটি গোপন সংস্থা।

'হান্টার'-এর কার্যকলাপ তাই এত রহস্যময়। কেউ বলে 'হান্টার' একটা গুপ্তচর সংস্থা। স্পাইদের আড্ডা। কেউ বলে, মোটেই না। 'হান্টার' গুপ্তচর নিয়োগ করে ঠিকই, কিন্তু রাজনীতি নিয়ে তাদের মাথাব্যথা নেই। ভারতীয় কারবারিদের ব্যাবসা যাতে বিশ্বের সর্বত্র ফলাও হয়, নির্বিঘ্নে বৃদ্ধি পায়—এজেন্টরা তা-ই দেখে। রেডিয়ো-ট্রান্সমিটারে খবর পাঠায় কেন্দ্রীয় দফতরে। খবর নেয়।

আসলে 'হান্টার' বেসরকারি সংগঠন। কিন্তু পাঁকে পা পড়লে সরকারও এদের দ্বারে ধারণা দেয়। সাহায্য নেয়।

কানাঘুষো অনেকরকমই শোনা যায়। মাঝে মাঝে 'ইন্টারপোল' বা আন্তর্জাতিক পুলিশবাহিনীর মতো তৎপর হতে দেখা যায় হান্টার-এজেন্টদের। দেশে-বিদেশে কুখ্যাত ঠগরা টিট হয় এদের হাতে। ইন্ডিয়ান কারবারিদের কেউ পথে বসানোর প্ল্যান করে তার পার পায় না। জুয়াচোররা ভয় পায় হান্টারকে।

এই কারণেই কি না জানা নেই, দায়ে পড়লে টনক নড়ে সরকারি মহলের। পৃথিবীময় ছড়ানো হান্টার-এর গুপ্তচরজালের অসাধ্য নাকি কিছু নেই। অর্থ দেয়। কাজ নেয়।

আবার চাণক্য চাকলাদার!

সন্ধেবেলা জানলার সামনে বসে নারকেলের টুকরো দিয়ে তেল-মুড়ি খাচ্ছি, এমন সময়ে সরু আর লম্বা লম্বা ঠ্যাং ফেলে, উটপাখির মতো হেঁটে ঘরে ঢুকল চাণক্য চাকলাদার।

ঢুকেই বললে, 'দাদার কি নতুন গল্প দরকার আছে?'

বুঝলাম, আফিমের মৌতাত ভালোই জমেছে। কিন্তু এতদিন মক্কেল ছিল কোথায়?

জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায় থাকা হয়েছিল এই ক-বছর?'

'আফ্রিকায়,' বলে বাটি থেকে এক খাবলা মুড়ি-নারকেল তুলে নিয়ে মুখে পুরে একবার চিবিয়েই কোঁত করে গিলে নিয়ে বললে, 'হিরের খনির খোঁজে।' আমি সঙ্গে সঙ্গে হাঁ করেছিলাম পালটা প্রশ্ন করব বলে, কিন্তু তার আগেই ও বললে, 'গোরিলাদের পেছন পেছন ঘুরে সন্ধানও পেয়েছি। কিন্তু—'

বলে, আবার হাত বাড়াল বাটির দিকে।

আমি গোটা বাটিটাই হাতে তুলে দিয়ে বললাম, 'আফিম খেয়ে এসেছ বলেই খিদেটা বেড়েছে। খাও, সবটা খাও। কিন্তু গোরিলারা তোমায় ছেড়ে দিল কোন আক্কেলে?'

'ধরে রাখতেই বা যাবে কোন আক্কেলে?' যেন আকাশ থেকে পড়ল চাণক্য, 'ওরা নিজের বউ পর্যন্ত ছেড়ে দেয় নতুন মানুষ—আই মিন, নতুন গোরিলার হাতে। আমি তো স্রেফ ফ্রেন্ড।'

'ফ্রেন্ড?'

'ইয়েস, মাই বিগ ব্রাদার। গোরিলাদের যা ভাবেন, তা নয়। চার বছর আগে আমি যখন ভলক্যানো-সুদ্ধু বিরাট অঞ্চলটা কিনে নিয়ে একটু-আধটু চাষ-আবাদ আরম্ভ করেছিলাম, তখন অবশ্য কাকপক্ষীকেও জানতে দিইনি আমার আসল উদ্দেশ্যটা কী। এখনও কেউ জানে না—আপনি ছাড়া।'

'ভলক্যানো!'

বিশ্ববিখ্যাত ঘনাদা যেভাবে কৃপাপূর্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করে অর্বাচীনের মতো প্রশ্ন শুনলে, অনেকটা সেইভাবে নিমীলিত চোখে আমাকে নিরীক্ষণ করে চাণক্য বললে, 'অদ্রীশবাবু, আপনার সব আছে—কেবল চট করে বোঝার ক্ষমতাটা নেই। ভলক্যানো মানে আগ্নেয়গিরি। শুনে অমন আঁতকে ওঠার কী আছে?'

'আফ্রিকার কোন অঞ্চলে?'

'ব্যাস, এই আপনাদের এক রোগ। গল্প শুনতে বসেছেন, গল্প শুনে যান। অত ল্যাটিচিউড-লঙ্গিচিউড জানবার দরকারটা কী?'

'না, মানে, ভলক্যানো বলছ তো—'

'শুনুন দাদা, নাম-ঠিকানা জানতে চাইবেন না। হিরের খনি খুঁজে বার করব আমি, আর আপনি দেশসুদ্ধু হাঘরেকে নাম-ঠিকানা জানিয়ে লেলিয়ে দেবেন আমার পেছনে, সেটি হতে দিচ্ছি না।'

'আচ্ছা, আচ্ছা, ঠিক আছে। ভলক্যানো-সুদ্ধু জায়গাটা তুমি কিনে নিলে চাষ-আবাদের অছিলায়। তারপর?'

'খবরটা আগেই পেয়েছিলাম। কোত্থেকে পেয়েছিলাম—অত খবরে দরকার কী আপনার? কিন্তু যেই শুনলাম, আফ্রিকার অমুক অঞ্চলে কাঁড়ি কাঁড়ি হিরে গড়াগড়ি যাচ্ছে, অথচ আগ্নেয়গিরি আর গোরিলার ভয়ে কেউ সে অঞ্চলে যেতে সাহস পায় না বলে হিরের খনির সন্ধান এখনও পায়নি, তখনই ঠিক করে ফেললাম, কুছ পরোয়া নেহি। হাম জায়েগা।

'ঠিক চার বছর আগে কিনে নিলাম পুরো এস্টেটটা। সে কী ঘন জঙ্গল। মাঝে একটা বিরাট লেক পর্যন্ত আছে। একধারে পাশাপাশি দুটো পাহাড়। একটা ভলক্যানো। ন-মাসে, ছ-মাসে একবার লাভা বেরোয় জ্বালামুখ দিয়ে। এমনিতে ঠান্ডা। কিন্তু ভেতরে চাপা আগুন। অমাবস্যার রাতে জ্বালামুখের কাছে লাল আভাও দেখা যায় মাঝে মাঝে। সবচেয়ে ভালো লাগে পূর্ণিমার রাতে। দুটো পাহাড়ই পুরোপুরি দেখা যায়। দেখা যায় ঘন জঙ্গলের ঢেউ। সে যে কী ভীষণ, অথচ সুন্দর, তা নিজের চোখে না দেখলে আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না।

দ্বিতীয় কুম্ভকর্ণ

গ্রিক কথন

অদ্রীশ বর্ধন এবারে উপহার দিচ্ছেন মহাভারত থেকে গ্রহণ করা একটা আইডিয়ার বিজ্ঞানভিত্তিক কল্পকাহিনি। শ্বাসরোধী এই ফ্যান্টাসায়ান্স বিবৃত হয়েছে দশটি অধ্যায়ে। অধ্যায়গুলির নামকরণ থেকেই আঁচ করা যাবে, দুর্ধর্ষ এই কাহিনি দশবার মোড় নিয়েছে দশ রকমের অ্যাডভেঞ্চারকে হাজির করার জন্যে—কিন্তু মূলসূত্র ছিন্ন হয়নি কোথাও।

কম্পিউটারই সেই মূলসূত্র। উদ্দাম কাহিনিস্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়ার আগে মনে রাখো অধ্যায় দশটার নাম।

এক, চলমান কম্পিউটার, দুই, জীবন্ত কম্পিউটার, তিন, ফ্লায়িং সসার কম্পিউটার, চার, সুপারগার্ল কম্পিউটার, পাঁচ, দানব কম্পিউটার, ছয়, বিবরবাসী কম্পিউটার, সাত, মহাভারতীয় কম্পিউটার, আট, মলিকিউল কম্পিউটার, নয়, ব্ল্যাকহোল অভিমুখে কম্পিউটার, দশ, বিষণ্ণ কম্পিউটার।

এক
চলমান কম্পিউটার

পরপর তিন টিপ নস্যি নিয়ে ফেললাম। স্পেশ্যাল স্ট্রং নস্যি। ডাবল এক্স ব্ল্যান্ড।

ব্রেন চনমনে হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। গল্পের বীজ এতক্ষণে এসে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। চতুর্থবারে ক্ষিপ্ত হয়ে নস্যির কৌটোর বদলে আঙুল ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম কালির দোয়াতে অন্যমনস্ক হয়ে কালি-মাখা আঙুল নাকের ফুটোয় ঢুকিয়ে দিতেই টনক নড়ল। পাগল হয়ে যাচ্ছি নাকি?

ঠিক এই সময়ে ঘরে ঢুকল চাণক্য চাকলাদার। উটের মতন ঠ্যাং ফেলে ফেলে, আখাম্বা লম্বা শরীরটাকে অদ্ভুতভাবে হেলিয়ে-দুলিয়ে ঘরে ঢুকেই আমার কালি-মাখা নাকের দিকে চেয়ে রইল।

বললে চোখ নাচিয়ে, 'দাদার কি রাইটারস' ব্লক হয়েছে?'

মেজাজ এমনিতেই খিঁচড়ে ছিল, টিটকিরি শুনে সেই মেজাজ উঠল সপ্তমে। খুব রেগে গেলে আমি আবার কথা বলতে পারি না, তখন হয় ভয়েস ব্লক। কটমট করে শুধু চেয়েই রইলাম।

চাণক্য বুঝল। শরীরটাকে সেইরকম বিচ্ছিরিভাবে দুলিয়ে দুলিয়ে এসে বসল সামনের চেয়ারে। ঢলঢলে পাজামা-প্যান্ট আর বালিশের ওয়াড়ের মতন শার্ট দেখে হাড়পিত্তি জ্বলে গেল। চকরাবকরা কত কী ডিজাইন জামা-প্যান্টে। কোথাও বিকট পিশাচ সিং উঁচিয়ে তেড়ে আসছে। কোথাও রামছাগলকে সিংহাসনে বসিয়ে গলায় ফুলের মালা পরিয়ে পুজো করা হচ্ছে, কোথাও ধেইধেই করে বাঘ-সিংহ নাচছে, কোথাও গনগনে সূর্যের তলায় পৃথিবী চৌচির হয়ে যাচ্ছে, এরকম উৎকট নকশাবাজি জীবনে দেখিনি।

আমার ক্রোধানল কিন্তু প্রশমিত হয়ে গেল বিটকেল ওইসব ডিজাইনের কৃপায়। ভয়েস বক্স ক্লিয়ার হয়ে গেল। গলায় কথা ফুটল। প্রথম শব্দটা বেরুল এই—'কৃকলাস।'

সঙ্গে সঙ্গে চোখ দুটোকে ট্যারা করে ফেলল চাণক্য। পরমুহূর্তেই সোজা চোখে তাকিয়ে বলল, 'অর্থ?'

'মূর্খ কোথাকার! কৃকলাসের ছবি তো এঁকেছ জামায়, মানে জানো না?' বলে আঙুল ঠেকিয়ে দেখিয়ে দিলাম ছবিটা।

চোখ নামিয়ে দেখে নিয়ে চাণক্য বললে, 'আমাকে গিরগিটি বলছেন? কিন্তু কেন দাদা? কী অপরাধ করেছি?'

'তুমি বহুরূপী বলে। গিরগিটি যদি কখনও দু-পায়ে হাঁটে তাহলে সে হয়ে যাবে চাণক্য চাকলাদার।'

হা হা করে এমন একখানা হাসি হাসল চাণক্য, সাধুভাষায় যাকে অনায়াসে অট্টহাস্য বলা চলে। হাসতে হাসতে চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। শুকনো চামড়া

তুহিন-তমাল শ্বেত-প্রহেলিকা

বিশ্বাস-অবিশ্বাসের বাইরে

মুখ খুলতে বাধ্য হলাম। কারণ, বিজ্ঞানসাধকেরা আমার গায়ে-পড়া উপদেশ শুনতে নারাজ। কেন, তা বুঝছি না। জীবাশ্মশিকারিরা কুমেরু তছনছ করছে। সুপ্রাচীন তুহিনশিখর গলিয়ে দিচ্ছে, ধসিয়ে দিচ্ছে, ফুটো বানিয়ে বানিয়ে ঝাঁঝরা করে তুলছে। বারণ করেছিলাম কেন, তা অবশ্য বলিনি। কেউ বিশ্বাস করত না, উলটে হাসিঠাট্টার হুল্লোড় পড়ে যেত।

প্রকৃত ঘটনার উদ্‌ঘাটন যখন ঘটাব, তখন তার সত্যতা নিয়ে সংশয় অনিবার্যভাবে দেখা দেবেই। অবিশ্বাস্য বলে মনে হবে।

বেশ কিছু ফোটোগ্রাফ লোকচক্ষুর আড়ালে রেখেছি আজও। তার মধ্যে আছে অর্ডিনারি ফোটোগ্রাফ আর আকাশ থেকে তোলা ফোটোগ্রাফ। এই ফোটোগুলো দেখলে অবিশ্বাসের অপনোদন ঘটবেই।

উদ্ভট অভিযান আমার বৈজ্ঞানিক জীবনে নতুন কিছু নয়। লোকে আমার নাম দিয়েছে 'পাগলা বৈজ্ঞানিক'। স্বকর্ণে না শুনলেও আভাসে ইংগিতে তা বুঝি। আমার নিত্যসহচর, অন্ধভক্ত এবং নির্বোধ—দীননাথ নাথ, আমার আপাত আজগুবি কাণ্ডকারখানা নিয়ে অনেক কিম্ভূত কাহিনি রচনা করেছে। ও মোটেই লেখক নয়—কিন্তু লেখার নেশা আছে। আর লেখকরা যখন নেশাচ্ছন্ন অবস্থায় লেখে, তখন

মাত্রা হারিয়ে ফেলে। মূল ঘটনাকে ছেড়ে ডালপালায় চলে গিয়ে।

তাই আমি এই লেখাটা নিজেই লিখতে বসেছি। মুখ যখন খুলেছি, তখন তা লেখার আকারে থাকা ভালো। মুখের কথার নড়চড় হয়। লেখা নড়ে না, পালটায় না।

কুমেরু নিয়ে আজকের দুনিয়ায় ভাবনা-চিন্তা, অভিযান করছে অনেক রথীমহারথী। সাধারণ মানুষও এখন কুমেরুর অনেক খবর রাখে। কিন্তু আমার মধ্যে কুমেরু নিয়ে অনুসন্ধিৎসা জেগেছিল বীভৎস আর উদ্ভট রসের বিশ্বশ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক এডগার অ্যালান পো-র পাঁচটা লাইন পড়বার পর। মাত্র পাঁচটা লাইনেই উনি বরফাবৃত কুমেরু অঞ্চলে একটা আগ্নেয়গিরির কথা লিখেছিলেন। যে আগুনপাহাড়ের গনগনে লাভাস্রোত গড়িয়ে নামছে বরফের ওপর দিয়ে। এই কল্প-কবিতা উনি লিখেছিলেন কুমেরুতে মাউন্ট এরেবাস আবিষ্কারের সাত বছর পরে।

বরফ প্রদেশের অগ্নিগর্ভ এই পর্বত আমি দেখেছিলাম কুমেরুতে গিয়ে।

আমি, শ্রীহীন প্রফেসর, বিশ্রী নামের অধিকারী নাটবল্টু চক্র, পাড়ি জমিয়েছিলাম পাঁচখানা বিশেষ বিমান, শ্লেজ টেনে নিয়ে যাওয়ার মতন বিয়াল্লিশটা বাঘা কুকুর, জনাকয়েক সহযোগী, বিস্তর লোকলস্কর, আর অবশ্যই আমার প্রশংসায় মুখর চ্যালা দীননাথকে নিয়ে।

ও হ্যাঁ, গুলবাজ চাণক্য চাকলাদারকে বাদ দিতে পারিনি। হাওয়ায় খবর পেয়ে ও দৌড়ে এসেছিল। অবিশ্বাস্য অসম্ভব খবরটবর ও রাখে। চক্ষু ছানাবড়া করার মতন বহু অভিযানে আমাকে জোর করে নিয়ে গিয়ে প্রমাণ করে ছেড়েছে, ও যা বলে, তার সবটাই ভাঁওতা নয়।

তুহিন তেপান্তরের চিরতুষার নাকি অনেক ভয়ানক ব্যাপার লোকচক্ষুর অন্তরালে রেখে দিয়েছে—এমনি একটা বিকট বিশ্বাস অনেক দিন ধরেই ওর বিদঘুটে মস্তিষ্কের রন্ধ্রে রন্ধ্রে উৎপাত চালিয়ে যাচ্ছিল। তাই ঠিক সময়ে হাজির হয়ে গেল এবং ছিনেজোঁকের মতন আমার সঙ্গে লেগে রইল।

এবার আসা যাক তুহিন তেপান্তরের কথায়।

দুর্লভ শিহরনের দেশে

সৃষ্টির শুরুতে প্রাণের রকমারি প্রকাশ যখন ঘটে চলেছে পৃথিবীময়, যখন সৃষ্টিকর্তা নিজেই লাখো লাখো এক্সপেরিমেন্ট নিয়ে ধুন্ধুমার কাণ্ড শুরু করেছেন এবং কোন

পরিশিষ্ট

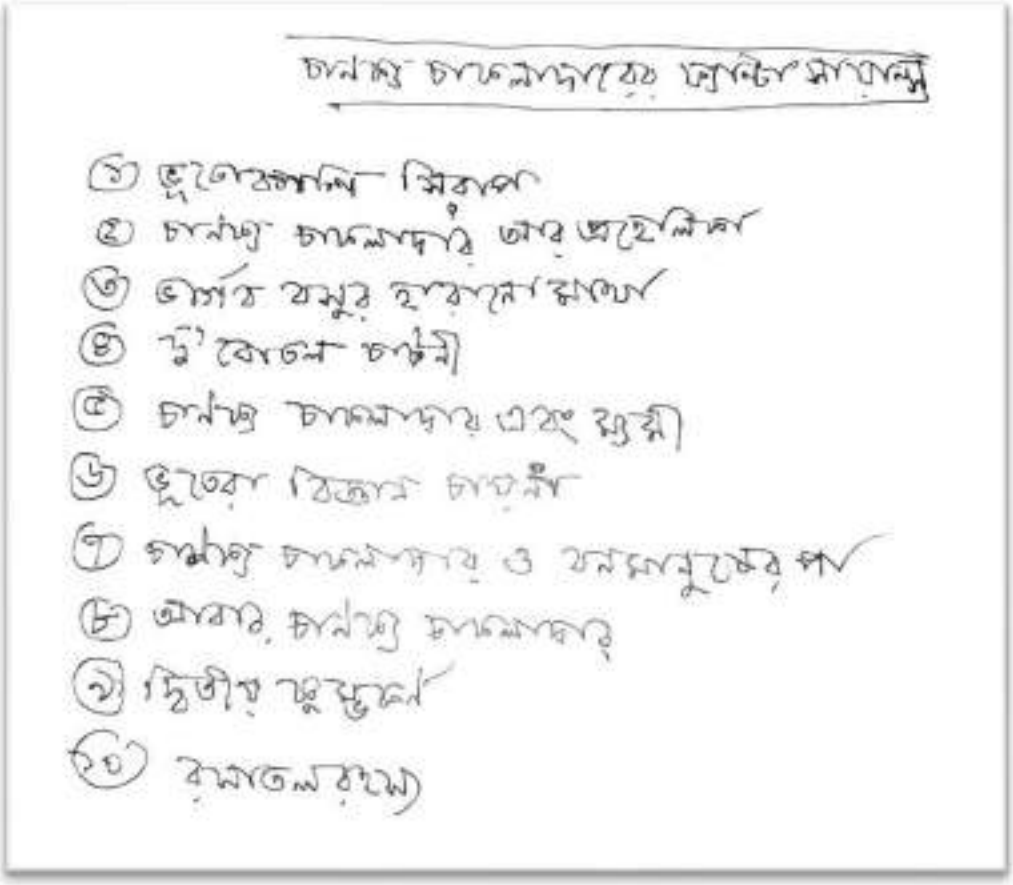

অদ্রীশ বর্ধন পরিকল্পনা করেছিলেন চাণক্য চাকলাদার চরিত্রটিকে নিয়ে নতুন একটি বইয়ের, খসড়া খাতায় বইটির নাম দিয়েছিলেন চাণক্য চাকলাদারের ফ্যান্টাসায়েন্স।

বিভিন্ন শিল্পীর তুলিতে চাণক্য চাকলাদারের গল্পের
শীর্ষচিত্র এবং অলংকরণ

'অমৃত' পত্রিকায় প্রকাশিত শীর্ষচিত্র, শিল্পী ধ্রুব রায়

"আমি ক্লিওপেট্রা !"

'বোধন' পত্রিকায় প্রকাশিত শীর্ষচিত্র ও অলংকরণ, শিল্পী নারায়ণ দেবনাথ

অদ্রীশ বর্ধনের হাতে লেখা পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠা